দ্যা লিটল প্রিন্স

লেখা এবং আঁকা

আন্তোয়ান দো সেইন্ট এগজুঁপেরি

ইংরেজিতে অনুবাদ

ক্যাথরিন উডস

বাংলায় অনুবাদ

নাজিয়া তাসনিম

মননে মুক্তির সৌরভ

দ্যা লিটল প্রিন্স

আন্তোয়ান দো সেইন্ট এগজুঁপেরি

ইংরেজিতে অনুবাদ | ক্যাথরিন উডস

বাংলায় অনুবাদ | নাজিয়া তাসনিম

সম্পাদনা | কাজী সালমা বিনতে সলিম

মননে মুক্তির সৌরভ

প্রথম প্রকাশ | রবিউল আউয়াল, ১৪৪৫ হিজরী
আশ্বিন, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ
অক্টোবর, ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ

প্রকাশনায় | শিউলিমালা প্রকাশন

গ্রন্থস্বত্ব | শিউলিমালা প্রকাশন

যোগাযোগ | shiulimalaacademy@gmail.com
Shiulimala Academy
Shiulimala Academy
Shiulimala

নির্ধারিত মূল্য | ২২০৳

ISBN | 978-984-96935-0-5

লেখক পরিচিতি

বিগত শতাব্দীতে আকাশে ওড়ার নেশা কিছু মানুষকে দুঃসাহসিক অভিযানের প্রেরণা যুগিয়েছিলো। অন্যদের ক্ষেত্রে তাদের আকাশে ওড়ার এ নেশা প্রযুক্তিতে নাটকীয় পরিবর্তন ঘটিয়েছিলো। কিন্তু আন্তোয়ান দো সেইন্ট এগজুঁপেরির ক্ষেত্রে তা ছিলো ভিন্ন। তার আকাশে ওড়ার নেশা সৃষ্টি করেছিলো অমর গল্প, যা বিশ্বের লক্ষ লক্ষ মানুষের হৃদয় স্পর্শ করেছিলো।

আন্তোয়ান দো সেইন্ট এগজুঁপেরি। জন্ম ১৯০০ সালে, ফ্রান্সের লিয়োঁতে। তরুণ আন্তোয়ানের ছিলো দুঃসাহসিক অভিযানের নেশা। সে প্রথমে নেভাল একাডেমিতে ভর্তি হতে চেয়েছিলো, কিন্তু ভর্তি পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয়। তারপর তার মাথায় বিমান চালনার ঝোঁক চেপে বসে। ১৯২১ সালে সে ফ্রান্সের বিমান বাহিনীতে যোগ দেয়। সেখানেই সে তার প্রথম বিমান চালনা শিখেছিলো। পাঁচ বছর পরে জনবসতি থেকে দূরবর্তী সাহারা মরুভূমির প্রত্যন্ত এলাকায় এয়ার মেইল চালনা শুরু করার জন্য সে বিমান বাহিনী ত্যাগ করে।

আন্তোয়ানের জন্য এটা ছিলো এক চমকপ্রদ অভিযান, যার পরতে পরতে ছিলো বিপদের হাতছানি। খোলা ককপিটে বসে দুই ডানার বিমান চালানোর সময়ে তাকে ঘূর্ণায়মান মরুঝড়ের সাথে লড়তে হতো। কখনো কখনো নিষ্ঠুর মরুচারী উপজাতিরা নিচ থেকে তার বিমানের দিকে লক্ষ্য করে গুলি ছুড়তো। এর চেয়ে বেশি রোমাঞ্চকর বিষয় আর

কী হতে পারে! সাহারা মরুভূমির উপর দিয়ে বিমান চালনার এসব অভিজ্ঞতা তাকে তার আকাশে ওড়ার প্রতি ভালবাসা নিয়ে রাত জেগে গল্প লিখতে অনুপ্রাণিত করেছিলো।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দামামা বেজে উঠলে সেইন্ট এগজুঁপেরি আবার ফ্রান্সের বিমান বাহিনীতে যোগ দেয়। ১৯৪০ সালে নাৎসি সৈন্যরা ফ্রান্স দখল করলে সে আমেরিকায় চলে যায়। তার ইচ্ছা ছিলো সে আমেরিকার পক্ষে আকাশ যুদ্ধে অংশ নেবে, কিন্তু বয়সের কারণে তাকে বাদ দেওয়া হয়। তখন নিজেকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য সে লিখতে শুরু করে। সে তার সাহারা মরুভূমির উপর বিমান চালনার অভিজ্ঞতা থেকে গল্প লিখে এবং ছবি আঁকে, যার ফলাফল তার বিখ্যাত বই দ্যা *লিটল প্রিন্স* (১৯৪৩)। রহস্যে ঘেরা এবং চমৎকার এ বইটা বছরের পর বছর শিশু থেকে বয়স্ক সবাইকে মুগ্ধ করেছে। এ বইয়ের বৈমানিক বিমান দুর্ঘটনার শিকার হয়ে সাহারা মরুভূমিতে আটকা পড়ে, সেখানে ভিনগ্রহের এক শিশুর সাথে তার দেখা হয়, যে জীবনকে বোঝার জন্য মহাবিশ্ব ভ্রমণে বেরিয়েছে। পৃথিবী ভ্রমণ শেষে সে শিশুটা জীবনের অর্থ বুঝতে পারে। শিশুটার সাথে কথপোকথনের শেষদিকে বৈমানিক তার বিমানটা সারতে সক্ষম হয় এবং তারপর তারা দু'জনেই যার যার বাড়িতে ফিরে যায়।

এ বইটা লিখা শেষ হওয়ার পরে আন্তোয়ান দো সেইন্ট এগজুঁপেরির ইচ্ছা পূরণের ডাক আসে, যুদ্ধ বিমান পরিচালনার জন্য তাকে উত্তর আফ্রিকায় পাঠানো হয়। ১৯৪৪ সালের ৩১ জুলাই সে এক অভিযানে বের হয়। দুঃখজনক বিষয় হলো সে অভিযান থেকে সে আর বেঁচে ফিরে আসেনি।

১

আমার বয়স তখন কেবল ছয়। সে সময়ে আমি "প্রকৃতির জগতের সত্য ঘটনা" নামক বইয়ে চমৎকার একটা ছবি দেখেছিলাম। বইটা ছিলো আদিম বন-জঙ্গল নিয়ে, আর ছবিটা ছিলো এক ধরনের অতিকায় অজগর সাপের, যেটা অন্য একটা প্রাণিকে গিলে খাচ্ছিলো।

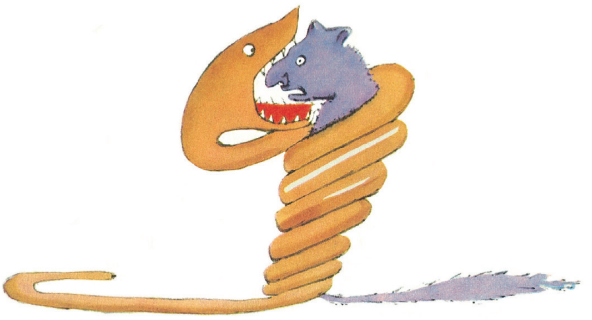

বইটাতে লেখা ছিলো, এ সাপগুলো তাদের শিকারকে চিবানো ছাড়াই সম্পূর্ণ গিলে খেয়ে ফেলে। খাওয়ার পরে তারা আর নড়াচড়া করতে পারে না এবং খাবার হজম হওয়ার জন্য পরবর্তী ছয় মাস ঘুমিয়ে কাটায়।

ছবিটা আমার মনে ব্যাপক প্রভাব ফেলেছিলো। আমি জঙ্গলের রহস্য নিয়ে গভীরভাবে ভাবতে শুরু করি। তারপর বেশ কয়েকবারের চেষ্টায় রং-পেন্সিলে আমি আমার প্রথম ছবি এঁকে ফেলি। আমার আঁকা প্রথম ছবিটা অনেকটা এমন :

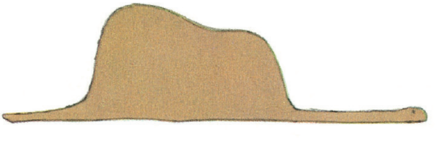

সে ছবি আমি বড়দের দেখিয়ে জানতে চাইলাম, এটা দেখে তারা ভয় পাচ্ছে কিনা। কিন্তু তারা উত্তর দিলো, "ভয়? একটা টুপির ছবি দেখে আমরা ভয় পাবো কেন?"

অথচ আমার ছবিটা কোনো টুপির ছবি ছিলো না, এটা ছিলো একটা অজগরের মস্ত বড় এক হাতি গিলে খেয়ে ফেলার ছবি।

যেহেতু বড়রা ছবিটা দেখে বুঝতে পারছিলো না, তাই আমি আরেকটা ছবি আঁকলাম। এবার আমি হাতিসহ অজগরের পেটের ভেতরের অংশ আঁকলাম, যাতে তারা বুঝতে পারে। আসলে বড়দেরকে সবকিছু ভালোমতো বুঝিয়ে বলতে হয়, না হয় তারা বোঝে না। আমার দ্বিতীয় ছবিটা এ রকম ছিলো :

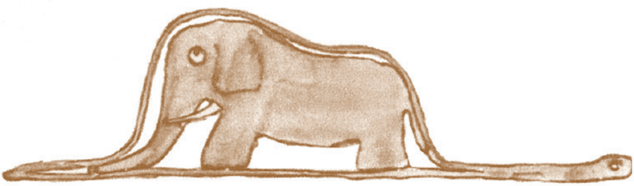

কিন্তু এবার তাদের উত্তর ছিলো ভিন্ন রকম। তারা আমাকে অজগরের ভেতর-বাহিরের ছবি আঁকা বাদ দিয়ে ভূগোল, ইতিহাস, গণিত এবং ব্যাকরণ পড়ায় মনোনিবেশ করতে বললো! এতে কষ্ট পেয়ে ছয় বছর বয়সের সেই ছোট্ট আমি আঁকাআঁকি ছেড়ে দিয়েছিলাম। অথচ তখন যদি উৎসাহ পেতাম, হয়তো আমি অনেক বড় একজন চিত্রশিল্পী হয়ে উঠতে পারতাম! আমি আমার আঁকা প্রথম দুইটা ছবি নিয়েই খুব দুঃখ পেয়েছিলাম। বড়রা কেন যেন নিজ থেকে ছোটদের মনোভাব বোঝে না! আর তাদেরকে সবকিছু বুঝিয়ে দেওয়া ছোটদের পক্ষে প্রায় অসাধ্য একটা ব্যাপার। অতঃপর আমি চিত্রশিল্পী হওয়ার স্বপ্ন বাদ দিয়ে ভিন্ন এক পেশা বেছে নিলাম। আমি বিমান চালনা শিখলাম। বিমান চালিয়ে আমি পৃথিবীর সব প্রান্তেই একটু একটু করে ঘুরে এলাম। এ কথা

সত্যি যে, বিমান চালনার ক্ষেত্রে ভূগোলের জ্ঞান আমাকে খুব সাহায্য করেছিলো। এ জ্ঞানের কারণেই এক পলকে আমি বলে দিতে পারি, কোনটা আমেরিকার প্রদেশ আরিজোনা আর কোনটা চীন। কেউ রাতে কোথাও হারিয়ে গেলে ভূগোলের জ্ঞানই তাকে পথ খুঁজে পেতে সাহায্য করবে।

যাই হোক, সেই ছয় বছর বয়স থেকেই বড়দের সম্পর্কে আমার অন্য রকম ধারণা ছিলো। পরবর্তীতে জীবন চলার পথে আমার অনেক বড় মানুষের সাথে দেখা হয়েছে। তারা সব সময় ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তিত থাকতেন। বড়দের সাথে আমি অনেক সময় কাটিয়েছি, তাদেরকে খুব কাছ থেকে দেখেছি। কিন্তু তারপরও তাদের সম্পর্কে আমার সে ধারণার খুব একটা পরিবর্তন হয়নি।

কারণ যখনি তাদের মধ্য থেকে কাওকে বিচক্ষণ মনে হতো, তাকে পরখ করার জন্য আমার আঁকা প্রথম ছবিটা দেখাতাম। এ ছবিটা আমি সব সময় আমার সাথেই রাখতাম! কারণ আমি তখন একজন সত্যিকার বুঝসম্পন্ন মানুষ খুঁজে বেড়াচ্ছিলাম, যে আমার ছবির অর্থ বুঝবে। কিন্তু নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবাই আমাকে হতাশ করেছিলো। যাকেই দেখাতাম, সেই বলতো, এটা একটা টুপির ছবি। তারপর আমি তাদের সাথে আর কখনোই অতিকায় অজগর, আদিম বন-জঙ্গল বা নক্ষত্ররাজি নিয়ে কথা বলার চেষ্টা করতাম না। বরং আমি নিজেকে তাদের পর্যায়ে নামিয়ে আনতাম, তাদের সাথে সেতু, গলফ খেলা, রাজনীতি, গলাবন্ধনী নিয়ে কথা বলতাম। এসব নিয়ে কথা বললেই বড়রা খুশি হতো এবং আমাকে বিচক্ষণ ভাবতো!

২

আমি এমন একজন মানুষও খুঁজে পাইনি, যার সাথে সত্যিকারার্থে কথা বলা যায়। কেউই আমার ছবির অর্থ বোঝেনি। আর তাই আমি একাকী জীবন বেছে নিই। এভাবেই সময় কাটতে থাকে। কিন্তু ছয় বছর আগে সাহারা মরুভূমিতে আমি বিমান দুর্ঘটনার শিকার হই, যা আমার জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দেয়। সে দুর্ঘটনায় আমার বিমানের ইঞ্জিনের কিছু অংশ ভেঙে গিয়েছিলো। তখন আমার সাথে না ছিলো কোনো মেকানিক, না ছিলো কোনো যাত্রী। দুর্ঘটনার স্থানের আশেপাশে জনবসতি না থাকার কারণে কোনো মেকানিক বা সাহায্য করার মতো মানুষ খুঁজে পাওয়াও ছিলো দুষ্কর। তাই আমি নিজেই ইঞ্জিন সারানোর মতো জটিল কাজটা করার চেষ্টা করছিলাম। ইঞ্জিন সারানোটা আমার জন্য জীবন-মৃত্যুর প্রশ্ন ছিলো। কারণ আমার কাছে এক সপ্তাহ অতিবাহিত করার মতোও পর্যাপ্ত পরিমাণ পানি ছিলো না। এ সময়ের মধ্যে ইঞ্জিন সারাতে না পারলে পিপাসা-ক্ষুধায় আমি মারা যাবো।

দুর্ঘটনা পরবর্তী প্রথম রাতে জনবসতি থেকে হাজার মাইল দূরবর্তী সেই মরুভূমির বালির উপর আমি একাকী ঘুমানোর প্রস্তুতি নিলাম। নিজেকে তখন অথৈ সাগরের বুকে ছোট্ট একটা ভেলায় ভেসে থাকা কোনো এক ধ্বংসপ্রাপ্ত জাহাজের নাবিকের চেয়েও বেশি একাকী মনে হচ্ছিলো। ক্লান্ত-শ্রান্ত, দুশ্চিন্তাগ্রস্থ আমি বালির উপর ঘুমিয়ে পড়লাম।

পরের দিন ভোরে সেই বিজন মরুবেলায় ভোরের সূর্যের প্রথম আলোকরশ্মি যখন কেবল আমাকে স্পর্শ করলো, তখন এক অদ্ভুত কচি কণ্ঠস্বর শুনে আমার ঘুম ভাঙলো। আমি খুবই বিস্মিত হয়েছিলাম, এ একাকী মরুভূমিতে কে এলো! তখন ছোট কণ্ঠটা বলে উঠলো,

- তুমি কি আমাকে একটা ভেড়ার ছবি এঁকে দেবে?

- কী!

- একটা ভেড়ার ছবি এঁকে দাও না!

আমি বজ্রাহতের মতো লাফিয়ে উঠলাম। ভালোমতো চোখের পলক ফেলে চারপাশে সাবধানে তাকালাম। দেখতে পেলাম, এক বিস্ময়কর ছোট্ট বালক আমাকে গভীরভাবে পরখ করছিলো। বালকটা দেখতে কেমন ছিলো সে সম্পর্কে ধারণা দেওয়ার জন্য এখানে আমি তার একটা ছবি দিলাম। এ ছবিটা আমি পরে এঁকেছিলাম। কিন্তু বালকটা ছবির চেয়ে অনেক বেশি মনোমুগ্ধকর ছিলো।

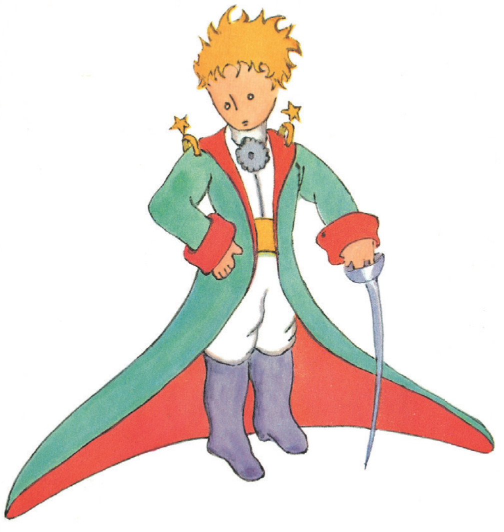

ছবিতে তাকে সুন্দর করে ফুটিয়ে তুলতে না পারাটা অবশ্য আমার দোষ নয়! কারণ তোমরা জানোই, ছয় বছর বয়সে আমাকে বড়রা ছবি আঁকতে নিরুৎসাহিত করার কারণে আমি অজগরের ভেতর-বাহির আঁকা ছাড়া আর কিছুই আঁকতে শিখিনি।

যাই হোক, আমি বিস্ময়াভিভূত হয়ে পলকহীন চোখে বালকটার দিকে চেয়ে রইলাম। ভাবছিলাম, জনবসতি থেকে হাজার মাইল দূরে এ বিরান মরুতে সে কেন এলো! সে যে মরুভূমিতে পথ হারিয়ে ফেলা কোনো

বালক নয়, তা তাকে দেখেই বোঝা যাচ্ছিলো। ক্ষুধা-তৃষ্ণা, ভয় বা ক্লান্তির কোনো ছাপ তার চেহারায় ছিলো না। অবশেষে আমি নিজেকে সামলে নিয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করলাম,

– কিন্তু তুমি এখানে কী করছো?

– তুমি যদি আমাকে একটা ভেড়া এঁকে দিতে!

সে আবারও একই কথা বললো! এ কথা সে এতটাই ধীরে ধীরে বলছিলো, যেন সে খুব গুরুত্বপূর্ণ কিছু বলছে।

রহস্যপ্রবণ মানুষের মন গূঢ় রহস্যের ডাক এড়িয়ে যেতে পারে না! শুনতে অদ্ভুত শোনালেও সত্য, সেই বিজন মরুভূমিতে জীবন-মৃত্যুর মাঝামাঝিতে দাঁড়িয়েও আমি পকেট থেকে কাগজ আর ঝর্ণা কলম বের করে আঁকতে বসে গেলাম।

কিন্তু তখন আমার মনে পড়লো, আমি তো এতদিন ভূগোল, ইতিহাস, অঙ্কশাস্ত্র আর ব্যাকরণ পড়ায় নিবিষ্ট ছিলাম, আঁকাআঁকি করিনি। তাই ভেড়ার ছবি আঁকা আমার পক্ষে প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। আমি বালকটাকে কিছুটা রুক্ষ স্বরে বললাম,

– আমি আঁকতে পারি না!

– তাতে কিছু আসে-যায় না। তোমাকে এঁকে দিতেই হবে।

সে ভাবলেশহীনভাবে উত্তর দিলো।

কিন্তু আমি তো কখনো ভেড়ার ছবি আঁকিনি, ভেড়া কীভাবে আঁকতে হয় তাও জানি না! তাই আমি ভেড়া না এঁকে আমার পূর্বে আঁকা ছবি দুইটার একটা এঁকে দিলাম। এটা ছিলো অজগরের বাহিরের দিকের ছবিটা। ছবিটা তাকে দেখানোর পরের মুহূর্ত ছিলো আমার স্তম্ভিত হওয়ার পালা! আমার ছোট্ট সঙ্গীটা বলে উঠলো,

– না, না। আমি কোনো অজগরের পেটে গিলে খাওয়া হাতির ছবি চাই না। অজগর খুব ভয়ংকর একটা প্রাণি। আর হাতি অনেক বিশাল। আমি

যেখানে থাকি, সেখানের সবকিছু অনেক ছোট ছোট। ভেড়া আকৃতিতে ছোট। তাই আমার প্রয়োজন একটা ভেড়ার ছবি। আমাকে একটা ভেড়া এঁকে দাও।

তারপর আমি বাধ্য হয়ে কোনো রকমে একটা ভেড়ার ছবি আঁকলাম।

সে খুব মনোযোগ দিয়ে ছবিটা দেখলো, তারপর বললো,

– এ ভেড়াটা খুব রোগাটে। তুমি আমাকে আরেকটা ভেড়া এঁকে দাও।

আমি আরেকটা ভেড়া আঁকলাম।

এ ছবি দেখে আমার ছোট্ট বন্ধু মৃদু হাসলো, যেন সে মজা পেয়েছে! তারপর বললো,

– তুমি নিজেই দেখো, এটা ভেড়া হয়নি, হয়েছে মেষ। এর শিং আছে!

আমি আবার একটা ভেড়া আঁকলাম।

কিন্তু আগেরগুলোর মতো এটাও তার পছন্দ হলো না। সে বললো,

– এ ভেড়াটা অনেক বৃদ্ধ। আমি এমন একটা ভেড়া চাই, যেটা অনেক বছর বাঁচবে।

ততক্ষণে আমার ধৈর্য ফুরিয়ে গেছে, কারণ আমি তখন আমার বিমানের ইঞ্জিন আলাদা করার তাড়ায় ছিলাম। তাই আমি আর কিছু না ভেবে নিচের এ ছবিটা আঁকলাম এবং সাথে একটা ব্যাখ্যাও দিলাম।

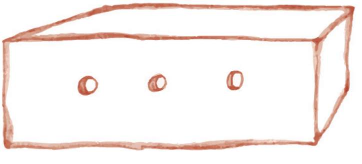

বললাম,
- এটা ভেড়ার বাক্স। আর তোমার ভেড়াটা এ বাক্সের মধ্যেই আছে।

এ কথা শুনেই যেন বালকটার মুখ খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো! আমাকে বিস্মিত করে দিয়ে সে বললো,
– ঠিক এমন একটা ছবিই আমি চেয়েছিলাম! তুমি কি মনে করো, এ ভেড়ার জন্য প্রচুর ঘাস প্রয়োজন?

– হঠাৎ এ প্রশ্ন কেন?

– কারণ আমি যেখানে থাকি, সেখানের সবকিছুই অনেক ছোট।

– সেখানে নিশ্চয়ই এ ভেড়ার জন্য যথেষ্ট পরিমাণ ঘাস থাকবে। কারণ আমি তোমাকে খুবই ছোট একটা ভেড়া দিয়েছি। ছোট ভেড়ারা কম ঘাস খায়।

সে মাথা ঝুঁকিয়ে ছবিটা খুব ভালোভাবে দেখলো। তারপর বললো,

– ভেড়াটা ততটাও ছোট নয়।

তারপর হঠাৎ উচ্ছ্বসিত হয়ে বললো,
– দেখো, দেখো! আমার ভেড়া ঘুমিয়ে পড়েছে!

এটা ছিলো সেই ছোট্ট রাজপুত্রের সাথে আমার প্রথম পরিচয়ের গল্প।

৩

ছোট্ট রাজপুত্র কোথা থেকে এসেছিলো তা জানতে আমাকে অনেক অপেক্ষা করতে হয়েছিলো।

সে আমাকে একের পর এক প্রশ্ন করে যাচ্ছিলো, কিন্তু আমার কোনো প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছিলো না। তাই তাকে বার বার জিজ্ঞেস করেও কোনো লাভ হয়নি, বরং আমি তার বলা কথা থেকেই একটু একটু করে তার পরিচয় খুঁজে নিয়েছিলাম।

সে প্রথম যখন আমার বিমানটা (বিমানের ছবি এখানে আঁকলাম না। বিমান আঁকা অনেক কঠিন কাজ!) দেখেছিলো, সাথে সাথে আমাকে প্রশ্ন করলো,
- এটা কী জিনিস?

আমি কিছুটা গর্বের সাথে উত্তর দিলাম,